মিলনসাগর
www.milansagar.com

রসরূপমন্ত্র দ্রষ্টা : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

দিলীপ বিশ্বাস

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের আর এক প্রিয় নাম বটুকদা। সার্বজনীন ভালবাসার নাম বটুকদা। সাড়াজাগানো গণসঙ্গীতের ভগীরথ জ্যোতিরিন্দ্র। "ফ্যান দাও, প্রাণ দাও। নবজীবনের সমীরণ চোখে মুখে ছড়াও" গানের রসরূপমন্ত্রদ্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অবশেষে বিদায় নিলেন। বটুকদা শুধু স্মৃতি নয়— উদ্দীপ্ত প্রেরণার আবেগময় এক প্রতিষ্ঠান। তাঁর নাম ও স্মৃতির সঙ্গে, দুঃখবেদনা যুক্ত হোক, কবি তা চান নি। তাই তাঁর শোকযাত্রায় শোক ছিল না— ছিল তাঁরই স্বরচিত আনন্দগান, মন্ত্রগান "এস মুক্ত কর,— মুক্ত কর,— অন্ধকারের এই দ্বার/এস শিল্পী, এস বিশ্বকর্মা, এস স্রষ্টা/রসরূপমন্ত্র দ্রষ্টা/ছিন্ন কর,— বন্ধনের এ অন্ধকার॥"

মাত্র চার বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের দর্শন লাভের সুযোগ ঘটে জ্যোতিরিন্দ্রের, তার নিজের বাড়ীতে, পাবনা সম্মেলনের সূত্রে। শৈশবের বিকাশের দিনগুলি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছে। ঠাকুরবাড়ীতে যাতায়াত ছিল। স্বয়ং ইন্দিরাদেবী, সরলাদেবীর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে দীক্ষা। আর ছিল দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত। তাছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যান্য দিকপাল অনাদি দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেব প্রমুখের সাহচর্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার সৌভাগ্য এসেছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও রবীন্দ্ররশ্মির প্রভাব পড়ল কবিতা রচনার ক্ষেত্রে। 'বলাকা'র অনুকরণে কবিতা লেখার প্রারম্ভ ১৯২৮-এ।

শাস্ত্রীয় গানের আবহাওয়া পারিবারিক ঐতিহ্যে ছিল। তখন তানপুরার সাহায্যে ভৈরোঁ সাধার রেওয়াজ চলছে। রাত্রিগুলো ঝড়ের গতিতে কাটছে বাদল খাঁর আড্ডায় হোরি, বসন্ত আর ভৈরবী রাগ শুনে। ১৯৩০ সালে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ। এই আলাপ ক্রমে প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতায়— আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে তুইয়ে পরিণত হল। ভীষ্মদেবের আকর্ষণে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুরের রাজ্য জ্যোতিরিন্দ্রকে উন্মাদ করে দিল। সেই থেকে ভীষ্মদেবের তালিমে এক টানা দশ বছর চলল সঙ্গীত সাধনার তপস্যা।

ইচ্ছে ছিল সঙ্গীতের সুররাজ্যে আর সাহিত্যের রসরাজ্যে ভবিষ্যৎ জীবনটা একান্ত নিভৃতে কাটিয়ে দেওয়ার। কিন্তু পরাধীন ভারতের রাজ্যপাটে তখন মেঘরৌদ্রের খেলা চলছিল। সাধ আর স্বপ্নগুলো এলোমেলা হয়ে যাচ্ছিল। চেতনার তলদেশে তোলপাড় বাঁধিয়ে স্বদেশীর প্রচণ্ড ধাক্কা এসে লাগল। অনুশীলন দলের সংস্পর্শে রিভলবার তুলে নিলেন। মাস্টারদার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কাহিনী, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কথা, কলেজ-ইউনিয়ন, গীতাপাঠ, বিবেকানন্দের গান, স্বদেশী গান, কুস্তি-লাঠি-জিমন্যাস্টিক্স্, শরীরচর্চা ইত্যাদির উন্মাদনা অস্তিত্বের মূলে নাড়া দিয়ে গেল। একদিকে যখন দেশকালের নির্মম বাস্তবতার তরঙ্গাঘাত আর এক দিকে তখন নীরব শিল্প-সঙ্গীত সাধনা। এই দুই দিগন্তের টানাটানির ফলে জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যে নতুন বোধের আর প্রশ্নের মন্ত্রপাঠ সুরু হয়ে গেল।

বই-লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ সালে, নতুন দিল্লির "কয়েলকাথ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালের ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

ঠিক এই সন্ধিক্ষণেই আলাপ হল সহপাঠী বিষ্ণু দের সঙ্গে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে। সেটা ১৯২২ সাল। তারপর বিষ্ণু দের বাড়ীতে বিদেশী সঙ্গীতের রেকর্ড শোনা। বাখ্-বেঠোফেনের মহান সুরশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া। আরো পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অলিগলির সন্ধান মিলল বিষ্ণু দের তাগিদেই, তিনি আলাপ করে দিলেন নীরদ চৌধুরী ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নীরদবাবু ও চঞ্চলবাবু ইউরোপীয় সঙ্গীতের রেকর্ডের ভাণ্ডার উজার করে দিলেন জ্যোতিরিন্দ্রের সামনে।

বিষ্ণু দে আরো এগিয়ে নিয়ে চললেন জ্যোতিরিন্দ্রকে, নিয়ে এলেন 'পরিচয়' পত্রের আড্ডায়। এখানে ডাঃ ভূপেন দত্ত, সুরেন গোস্বামী, নীরেন রায়, হীরেণ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার প্রমুখ বিদগ্ধজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল। 'পরিচয়ে'র আড্ডা অর্থাৎ বিশ্বপরিচয়ের সন্ধান। 'পরিচয়ে'র পথ ধরেই মার্কসবাদে হাতেখড়ি, বিশ্বসংস্কৃতির পরিচয়। এরপর রঁলা, বারবুস, অডেন, স্টিফেন স্পেণ্ডার, গোর্কী, কডওয়েলের সাহিত্য-সমুদ্রে অবগাহন করে জ্যোতিরিন্দ্র এসে পড়লেন মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিনের স্টাডি-সার্কলে। ক্রমে নীরবতার যুগ থেকে গুপ্ত পার্টির সংস্পর্শে এসে আলাপ হল রণেন সেন, গোপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে। এইভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা আঁকাবাঁকা পথ ধরে 'অগ্রণী' পত্রিকার আড্ডা, ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিট্যুট হয়ে বন্ধু বিনয় রায়ের হাত ধরে এসে পড়লেন ৪৬ নম্বরে (৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীট), অর্থাৎ লেখক-শিল্পীদের সাগরসঙ্গমে। তারপর যাতায়াত নিয়মিত হয়ে গেল গণনাট্য সংঘ, প্রগতি লেখক সংঘ ও ফ্যাসী-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের কার্যালয়ে।

পৃথিবীর আর এক প্রান্তে তখন হুংকৃত-যুদ্ধেরবাদ্য। বাজল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ভয়ঙ্কর নাৎসী দানবের আস্ফালন শোনা গেল ইউরোপের রণাঙ্গনে ১৯৪১ সালে। সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি আক্রান্ত হল বর্বর ফ্যাসিস্ট দস্যু হিটলারের হাতে। এল ভয় আর আতঙ্কের নিষ্প্রদীপ রাত্রি, চারিদিকে সাইরেনের শঙ্খধ্বনি, জাপানি বোমা-বিধ্বস্ত কলকাতা। এক বছর বাদেই বেয়াল্লিশের বহ্নিতে ভারতের আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত ও প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। একদিকে অমানবিক অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ্য দিবালোকে চলতে লাগল। অন্যদিকে প্রতিজ্ঞাপ্রস্তুত ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে উঠল।

জনসমুদ্র গর্জ্জে উঠল 'ইংরেজ ভারত ছাড়' । ঠিক তার পরই তেতাল্লিশে বাংলার বুকে কালরাত্রিরূপে মহাবিপর্যয় নেমে এল। নৃশংসতম ষড়যন্ত্রমূলক মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের আক্রমণে বাঙলা দেশের পঁয়ত্রিশ লক্ষ অসহায় নিরন্ন মানুষের পথের উপরে মৃত্যু হল। পথে পথে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের আর্তনাদের কোরাস শোনা যেতে লাগল। এই জঘন্য অধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রকে বিক্ষুব্ধ আলোড়িত করল, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ কবলিত বাঙলা প্রতিফলিত হয়ে উঠল তার মৃত্যুঞ্জয় গানে। নির্বিচারে হত্যা আর মৃত্যু দেখে কবি গেয়ে উঠলেন : " না না না/মানবো না মানবো না মানবো না/ কোটি মৃত্যুরে কিনে নেবো প্রাণপণে,/ভয়ের রাজ্যে থাকবো না।"

এরপর দুর্বার স্রোতে এল গানের প্লাবন। জীবন জাগানো আনন্দগান। গানের বিষয়ের জন্য কষ্টকল্পনার দরকার হল না। চোখ-খুললেই অজস্র বেদনার্ত ছবি। তারই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এসে গেল গানে। প্রতিফলিত হল : পথে পথে শঙ্কা/ মোড়ে মোড়ে বাজে মৃত্যুর জয় ডঙ্কা/ধন গৌরবে মাখা যুদ্ধের অঙ্গ/আমরা ত' সৈনিক/বুভুক্ষ দৈনিক/আমরা কি দেবো রণে ভঙ্গ?"

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কল্লোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

এ গানের সুর বাঁধলেন মালকোশে। লোকসঙ্গীতের চালে এই সুরকে ব্যবহার করা হল। অন্তরের বেদনা প্রতিবাদে মুখর হতে চাইল : ''হিংসা হেনেছে কত অস্ত্র/ধর্ষিতা পৃথ্বীরে করেছে বিবস্ত্র।'' দুর্গা রাগে এ গানকে বাঁধা হল। গানের পটভূমির কথা জ্যোতিরিন্দ্র 'নবজীবনের গানে'র ভূমিকায় ১৯৪৫ সালেই লিখে রেখে গেছেন : ''শুভ বুদ্ধির পরাজয় ঘটল। হিংসা, দম্ভ ও লোভের প্ররোচনায় সভ্যতা-বিরোধী শক্তির সৈন্য সমাবেশ চলল দেশে বিদেশে। আকাশে মাটিতে হাজার ঘাঁটিতে যন্ত্রগুলি উঠল নড়ে। মহাযুদ্ধ এল। এরই পটভূমিকায় গানগুলি লেখা হয়।'' কবির গানেও একই কথা শিল্পীত হল : 'দামামা বেজেছে! দামামা বেজেছে!! চারিদিকে রণরঙ্গে মেতেছে।/কোটি সিংহের ক্রুদ্ধ কেশর/ফুলে ফুলে ওঠে কালো মেঘে ঐ/বজ্র মেতেছে।/বিশ্বকর্মা গোপনে জটিল মন্ত্র পড়ে/আকাশে মাটিতে হাজার ঘাঁটিতে যন্ত্র নড়ে।/পিশাচ নৃত্যে মেতেছে কুটিল কংশ!/ধ্বংশ, ধ্বংশ, ধ্বংশ, ধ্বংশ ধ্বংশ।'' বাঙলা ভাষার এই মৃত্যুহীন গানটিকে হিন্দোল রাগে সুরবন্ধ করা হয়েছে।

'নবজীবনের গান' গীতিনাট্যে বিভিন্ন ভাবের ও সুরের গানগুলিকে একটি সুস্থির পরিকল্পনার ভিত্তিতে সুনিশ্চিত লক্ষ্যের পথে প্রবাহিত করা হয়। সেদিনের সেই রক্তাক্ত বেদনার কথাকে অপরাজেয় মানুষের প্রত্যয় ও সংকল্পে গাঁধা হয়। গীতিকার তার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

''প্রাণপণ করে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মৃত্যুকে কিনে নেবার দৃঢ় সংকল্প আছে নবজীবনের দূতদের। প্রথম গায়কদলে এই সুর উঠল ফুটে। এরা প্রাণধর্মে বিশ্বাসী এরা সভ্য এবং দেশাত্মবোধের প্রবল প্রেরণায় এরা চলিষ্ণু। দ্বিতীয় দলের আবির্ভাব প্রথম দলের ভাব-প্রবণতার উচ্ছ্বাসকে একটা দৃঢ় রূপ দেবার জন্য। এরা পথনির্দেশক। এরা কর্মী। এরা রাজনীতিক। এই দ্বিতীয় দলই প্রথম দৃষ্টি ফেরাল তৃতীয় দলের দিকে। তারা ক্ষুধার কান্না পেল শুনতে। তৃতীয় দল এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে, তাদের বিধ্বস্ত জীবনের কাহিনী নিয়ে। এই তৃতীয় দল দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, রণবিধ্বস্ত জনসাধারণ, গ্রামের চাষী মজুর ও নিম্নতম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক।

''কিন্তু থেকে থেকে তাদের কান্নাকে ডুবিয়ে দিয়ে উঠে আসে রণদামামার আর্তনাদ আর ধ্বংসের কোলাহল। এর পাশেই সৌখীনদের নিষ্ঠুর অতি ললিত গানের সুর আর শৃঙ্গারের অট্টরোল আসে ভেসে। সৌখীনরা তাদের নিজেদের মনের রঙ্গীন আকাশেই পাখি। সমস্ত বিশ্বের চরম ক্ষতিও তাদের মনে সাড়া দেয় না।

''কিন্তু তারাই সব নয়। দেশের মধ্যে এখনও রয়েছে তারা যারা ঝড়ে ভাঙ্গা ঘর বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে ওঠাবে। এরা চতুর্থ দল। এরা ভেঙ্গে পড়া গ্রামে প্রাণের দুর্গ বানাবার আশায় কর্মচঞ্চল। কিন্তু সেই চেষ্টার মধ্যে সাফল্যের ক্ষীণতম আভাসও বুঝি কর্মীর মনে অবাস্তব স্বপ্নবিলাস সৃষ্টি করে। পঞ্চম দল তারই প্রতীক। ষষ্ঠ দল কারখানার মজুর ও বিড়িওয়ালা— জনসাধারণের প্রতিনিধি— স্বপ্নবিলাস তারা মানবে না। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় মহামারীর তাণ্ডবের মাঝে এগিয়ে তাই সপ্তম দল— চিকিৎসক। তারা আজও রুগ্ন জীর্ণ সকলের মনে আশা দিতে চায়— ফুটো আয়ু তারা জোড়া দেবেই। তারপর— বেজে উঠবে যাত্রা শেষে শিকল ভাঙ্গার ঝঙ্কার— বঞ্চিত পদানতদের নব অধিকারপ্রাপ্ত বজ্রের স্বরলিপি।''

মিলনসাগর
www.milansagar.com

নবজীবনের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য কথা ও সুরের সার্থক ঐক্য। বিভিন্ন সুরের বৈপরীত্যের মাধ্যমে নাটকীয় গতিবেগ সঞ্চারে। কোথাও মালকোশ কোথাও দুর্গা রাগ আবার কোথাও লোকসঙ্গীতের সারি গানের সুরে লেখা "ও শহরের বন্ধুরে।/ঘরের বার করলো দেখি আমারে।/.....মরীচিকার ফাঁদে পড়ে এখন মরি শহরে/ঘরের বার করলো দেখি আমারে।" জ্যোতিরিন্দ্রের সুরসৃষ্টির প্রধান কথা নাটকীয় ভাবকে সঙ্গীতবদ্ধ করা আবার গীতধর্মকে নাটকীয় বেগ প্রদান করা। তিনি প্রচলিত গীতিনাট্যের রীতিতে 'নবজীবনের গান' রচনা করেন নি। এখানে ব্যক্তিগত মানুষের ভাব-আবেগের পরিবর্তে দলগত গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক মানুষের নাটকীয় রূপায়ণ আছে। সেদিনের মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে এ গানগুলি প্রচণ্ড বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করেছিল। গভীর উদ্দীপনায় মাতিয়ে তুলেছিল বঙ্গ ভূমিকে।

বাঙলা গানে স্বাদেশিকতা বহুদিন ধরে অনুসৃত হচ্ছিল। সন্ত্রাসবাদী সঙ্গীতে, স্বদেশী গানে, মুকুন্দদাসের যাত্রাগানে আর ক্ষুদিরামের বিষয়ে 'বিদায় দে মা' ইত্যাদি গানে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ বিরোধী সভ্যতার সঙ্কটকালীন জ্যোতিরিন্দ্রের 'নবজীবনের গান'গুলি ওই গানের অনুকরণ মাত্র নয়। এ গানের কথাবস্তু অনেক বলিষ্ঠ, সুরপ্রয়োগ অনেক সমৃদ্ধ। বিনয় রায় 'জনযুদ্ধের গান' গীতিসমষ্টির ভূমিকায় যথার্থ্য মন্তব্য করে গেছেন :

"কিন্তু এ শুধু 'স্বদেশী' আমলের স্বাদেশীকতার পুনরুজ্জীবন নয়। বলিষ্ঠ দেশপ্রেমের সঙ্গে এই গানের মধ্যে এসে মিলেছে ফ্যাসিজ্‌মকে রুখবার দুর্জ্জয় সংকল্প, ব্যাপক আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আর মজুর-কিষাণের জীবন ও সংগ্রামের কথা। ফলে আরও সমৃদ্ধ ও সুসঙ্গত হোয়ে উঠেছে সেদিনকার স্বাদেশিকতা। তাই এই গানের সহজ ও জোরালো কথার মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে ভাবী সংস্কৃতির ইঙ্গিত।" উপরের কথাগুলি সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য জ্যোতিরিন্দ্রের গান ও সুরসৃষ্টি প্রসঙ্গে।

'নবজীবনের গান' লেখা হয় ১৯৪৩-৪৪ সালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। সুর ও রচনা জ্যোতিরিন্দ্রের, স্বরলিপি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ও ভূমিকা লেখেন সরোজিনী নাইডু। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, বিনয় রায় প্রমুখেরা গানগুলি গেয়েছেন।

'নবজীবনের গান' ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রের কোন গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। 'ঝঞ্ঝার গান', ও 'মিছিল' প্রকাশিত হয় 'পরিচয়'-পত্রে ১৯৪৫-৪৬ সালে। 'নন্দীভৃঙ্গী সংবাদ' (তরজা) সলিল চৌধুরীর সম্পাদনায় 'গণনাট্য' পত্রের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় গীতিকার লেখেন : "নিম্নলিখিত তরজাটি মহাদেবের, লোকপুরাণের অন্তর্গত প্রাক-বৈদিক যুগের Tribal leader এবং তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা সকলেই ভূত। অর্থাৎ গণসাধারণ।" শেষে লেখা হয় পাঠকেরা আগ্রহশীল হলে স্বরলিপি ও অন্যান্য ডিটেল্‌স্ প্রকাশিত হবে। যাই হোক স্বরলিপি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। "পাহাড়, নদী ও মাটির গান"-এর (প্রথম পর্ব) 'সীমান্ত' কবিতা-পত্রের আশ্বিন, ১৯৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শুনেছি বিষ্ণু দের বৈঠকে এর কিছু অংশ গীত হয়েছিল, তবে স্বরলিপি অপ্রকাশিত। বিষ্ণু দের "স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ" কবিতাটি সুর সহযোগে জ্যোতিরিন্দ্র পরিচালিত করেন দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে ও

এই লেখাটি, নেত্রকোণা ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কল্লোলবাহী বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

কলকাতার রবীন্দ্রসদনে। এর সুরও সংগৃহীত হয়ে স্বরলিপি-বদ্ধ হওয়া উচিত। এছাড়া ''বাংলার গান আজ আকাশে, আগুন রাঙা মেঘে/বাংলা গান শুনি মুক্ত প্রাণে সুরে,/পদ্মার মেঘনার প্রবল প্রবাহে ধায় বেগে।'' ও ''পার্টির আজ বিপদ এসেছে ভারি।/আর ঘুম নয়, আর ঘুম নয়/ওঠো জাগো।'' ইত্যাদির মত বহু গান নানা পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র চলচ্চিত্রে সুচিন্তিত সুর ও শব্দ প্রয়োগের জন্যও অমর হয়ে থাকবেন। দীর্ঘকাল পূর্বে সেই ১৯৪৭ সালে তিনি 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র সঙ্গীত পরিচালনা করেন। এই চিত্রের সঙ্গীত প্রয়োগ নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। ছবির Title-এ সঙ্গীত প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ছবির মূল ভাবকে গোটা ছবিটির প্রস্তাবনার নান্দীমুখ পাঠের মত ছড়ার সপ্রয়োগ আছে। প্রধান গায়ক ছড়া গাইছে। সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে শিল্পীরা ধুয়া ধরেছে। ছড়ার সঙ্গে চলে কাঁসি, বাঁশি, গোপীযন্ত্র, ঢোল ও দোতারার সহযোগিতা। এখানে বাঙালীর নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রগুলির কল্পনাসমৃদ্ধ প্রয়োগরীতি লক্ষ করার জিনিস। পরিবেশকে চিৎকৃত সঙ্গীতে ভারাক্রান্ত না করে, নিপুণভাবে ছড়া ও সঙ্গীত-সৃষ্টির মাধ্যমে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ছবিটির চমৎকার frame-up রচনা করা হয়েছে।

এর পরই তার বিস্ময়কর সঙ্গীত-রচনা ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে। এ ছবির অভিনয়, ক্যামেরা, শব্দ-সঙ্গীত একপ্রাণ একতার বন্ধনে আবদ্ধ। একঘেয়ে যক্ষ্মা রোগীর কাশী, মানুষের কান্না, পাহাড়ী সুর, সেই সঙ্গে আকস্মিক আকাশভাঙ্গা ঐক্যতান সঙ্গীতের চরম ব্যঞ্জনা বটুকদাকে অক্ষর অমরত্ব দেবে। কি করে ভুলব এ ছবির বিচিত্র লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও ওস্তাদী সঙ্গীতের বুদ্ধিদীপ্ত সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে। কে ভুলবে অত্যাশ্চর্য পাখির ডাকের সুর, রেলগাড়ীর ডিবে বিচ্ছিন্নতার শব্দধ্বনিতরঙ্গ, চাবুকের শব্দ, সত্যপীরের পাঁচালি গান, তবলার লহরা— যন্ত্রের আর কণ্ঠের, শব্দের আর নিঃশব্দের অজস্র শৈল্পীক ব্যবহার।

তাই বিষ্ণু দের মত কবি 'মেঘে ঢাকা তারা'র সঙ্গীত পরিচালনা প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি জানিয়ে লেখেন : ''এ সবেতেই সঙ্গীত পরিচালকের বিচিত্র জ্ঞান ও প্রয়োগ ক্ষমতা অভিভূত করে দেয় এবং নমস্কার জানাতে ইচ্ছা হয় এই গুণীর প্রতি কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায়।....সামনে দেখলে বোঝা যায়, কেন মনে হয় সুপ্রিয়া চৌধুরীর কান্নার তরঙ্গ আমাদের স্নায়ু মন্থিত করে দিয়ে যায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সাঙ্গীতিক ধ্যানরূপের সমে বিষমে মানবোৎসারিত সমাজজীবনে ও বিশ্বব্যাপ্ত প্রকৃতির সংলগ্ন অর্থময়তায়।....এইটুকু নিশ্চয়ই বলা যায় যে সঙ্গীতের সামগ্রিকতায় এরকম দরদী সজাগ প্রয়োগ— নাকি সৃষ্টিই— অসামান্য রুচি জ্ঞান, সুরের ও কণ্ঠস্বরের ও নিছক ধ্বনির কর্তৃত্ব আমাদের ফিল্ম জগতে অভাবনীয় কীর্তি।'' ('বাঙলা ফিল্মের পরিণত রূপ, আমাদের জীবন ও মেঘে ঢাকা তারা'— বিষ্ণু দে/চিত্রকল্প/তৃতীয় খণ্ড/তৃতীয় সংখ্যা/১৩৮০)।

এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ পরিচালিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে নির্মিত 'রবীন্দ্রনাথ' জীবন তথ্যচিত্রটির সঙ্গীত প্রয়োগের কথাও উল্লেখযোগ্য। চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাহুল্য চলচ্চিত্রের পক্ষে হানিকর হবে, তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা ও সুর আবহ সঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হয়েছে এই চিত্রে। নাইট উপাধি পরিত্যাগে 'মোর বীণা আজি কোন সুরে ওঠে বাজি'; ডালহৌসি পাহাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্যে এস্রাজের আবহ; জালিয়ানবাগ হত্যাকাণ্ডে

মিলনসাগর
www.milansagar.com

ক্রমাগত ড্রামের বাদ্য; বর্ষার আবির্ভাবে 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু'; শান্তিনিকেতনে কবির পদচারণার আবহে 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' এবং সর্বশেষে সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে বহুজনের সমবেত স্বরে 'ঐ মহামানব আসে' ইত্যাদি অসাধারণ সঙ্গীতকর্মের আবেদন বিস্মৃত হবার নয়। এ ছাড়া ঋত্বিক ঘটকের 'আমার লেনিন' তথ্যচিত্রে জ্যোতিরিন্দ্র কৃত সঙ্গীত পরিচালনাও চলচ্চিত্র-সঙ্গীতের ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

জ্যোতিরিন্দ্র ভারতীয় কলাকেন্দ্রের তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস' ও 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' ইত্যাদি কয়েকটি ব্যালে ও অপেরার সুরস্রষ্টা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লম্বকর্ণ' পালার সুরসংযোজনাও তার অক্ষয় কীর্তির নিদর্শন হয়ে থাকবে।

গানের সঙ্গে বাংলা কবিতার জগতেও জ্যোতিরিন্দ্রের নাম স্বীকৃত হবে। কবিতার ক্ষেত্রে তার দান নিতান্ত অল্প নয়। বাংলা আধুনিক কবিতার তৃতীয় দশকের মধ্যপর্বে জ্যোতিরিন্দ্রের আবির্ভাব— সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কবিতার দিগন্তে নতুন ছন্দ, মাত্রা ও বাণী নিয়ে 'মধুবংশীর গলি'র প্রকাশ। একদা মাঠে-ঘাটে সভায়-সমাবেশে শম্ভু মিত্রের অসামান্য আবৃত্তির জন্য 'মধুবংশীর গলি' বাংলার ঘরে ঘরে সাড়া জাগিয়ে তোলে। ''দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবা ভগ্নজানু মন,/তোমাকে দেখেছি বারবার এ শহরে হে দুর্যোধন।/.....অর্জুন, অর্জুন শুধু!/অর্জুন, অর্জুন আজ লক্ষ লক্ষ জনগণমন।/দোর্দণ্ড গাণ্ডীব তাই অতি প্রয়োজন,/বৃহন্নলা ছিন্ন করো ক্লীব ছদ্মসজ্জার ব্যসন/বিদ্রোহের শমীবৃক্ষে সব্যসাচী অর্থ খোঁজে আজ।'' একদিন এসব পংক্তি বহু মানুষের মুখে মুখে আবৃত্ত হত।

জ্যোতিরিন্দ্রের সমস্ত কবিতা শিল্পোৎকর্ষের চরম বিন্দুতে সর্বদা স্পর্শ না করলেও অন্তত 'মধুবংশীর গলি' ও 'রাজধানীর' মত মহৎ দুটি কবিতার তুলনা নেই।

গত দু-তিন বছরে বটুকদা কয়েকটি স্মৃতিচারণ লিখেছেন— বেগম অখতার, বিনয় রায়, শচীনদেব বর্মণ ও 'নবজীবনের গান' প্রসঙ্গে। এবারের শারদীয় পত্রেও উদয়শঙ্কর ও ভীষ্মদেবের স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হয়েছে। ভীষ্মদেবের স্মৃতিচারণের একেবারে শেষ পংক্তিতে তিনি লিখেছেন : ''আমারে ভুলিও প্রিয়— কিন্তু, এ তো মৃত্যুহীন অনির্বাণ সুর, একে ভুলবো কি করে?'' এ যে জ্যোতিরিন্দ্র সম্পর্কেও সমান সত্য। 'একে ভুলব কি করে'? কবি বিষ্ণু দের জ্যোতিরিন্দ্র আলেখ্য যে আরো সত্য :

''যে বুভুক্ষু খুঁজে ফেরে তীব্র নবজীবনের গান,
যে স্বপ্নের প্রতিষ্ঠায় চিত্ত তার অশান্ত প্রয়াসী
.....আড্ডা সভা ধর্মঘট মিছিল উৎসব গণনাট্য গান মন্বন্তর
দেশভঙ্গ অনাচার জীবিকার ক্লান্তি আর কাজের উল্লাস
ঢেউ তোলে কবিতায় গানে যৌথ শিল্পের বিন্যাসে।
....ধ্রুপদে টপ্‌পায় কীর্তনে বাউলে ভাটিয়ালী কাওয়ালীতে
জারীগানে সারিগানে যাত্রায় গাজনে তুলসী দোঁহায়
সবেতে সে আগমনী শোনে আর গায়।
....আমাদেরই প্রতীক সে প্রিয়জন, অসহায়, আত্মভোলা,
সকলেই তাকে ভালবাসে॥''

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কবোলেবাস কর্মীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার নন্দ সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।